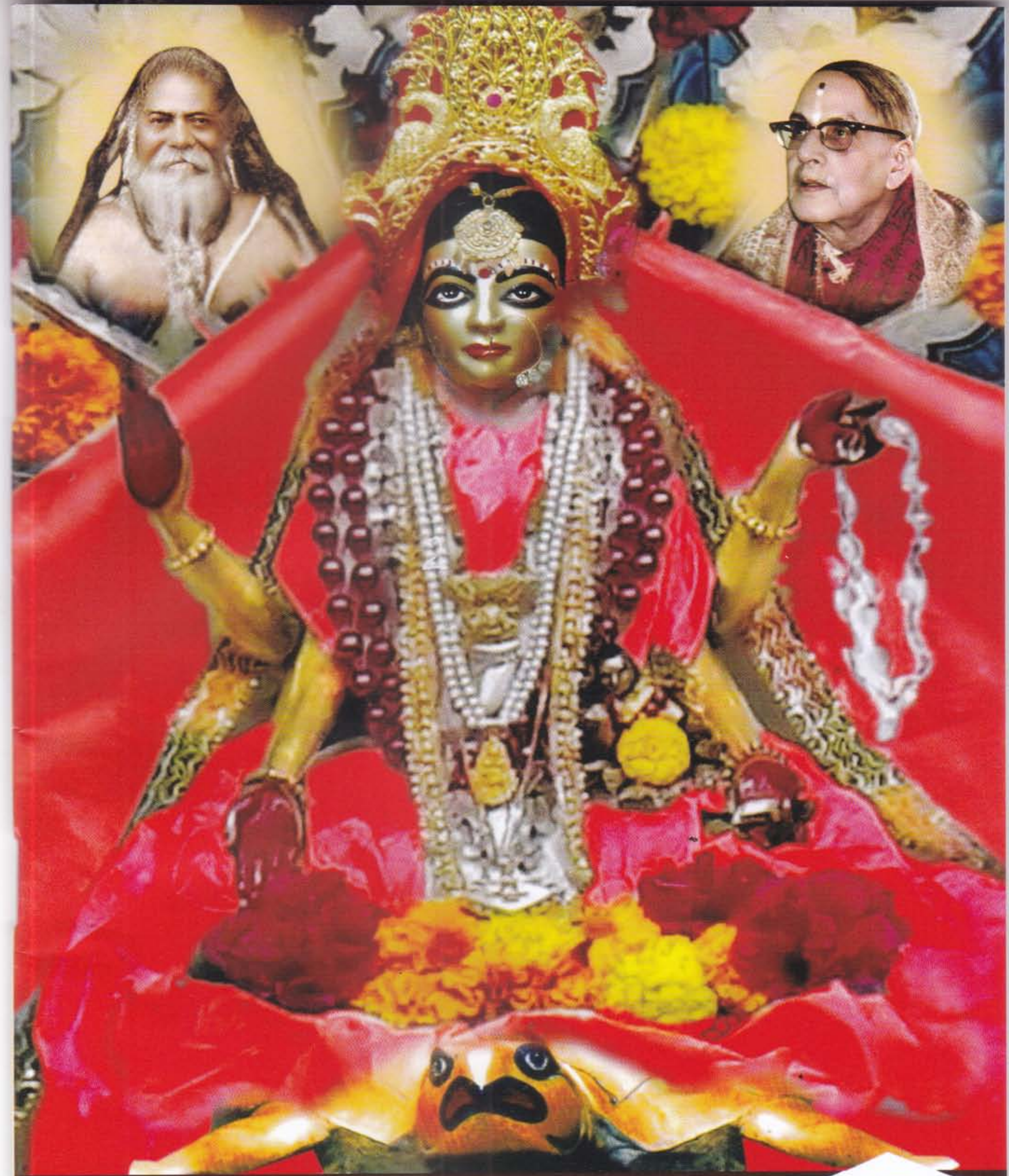

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
আবির্ভাব তিথি
২০২৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী সুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

৬৪ তম বর্ষ ● শুভ আবির্ভা ১৪৩২ সন ● চতুর্থ সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ		৮৬
গীতার মর্ম (পরবর্তী অংশ)	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৮৮
পুণ্য-পরশ-পুলক (২১শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৯০
শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী ভক্তের অনুভূতিতে (দ্বিতীয়পর্বের শেষাংশ)	শ্রী সোমনাথ সরকার	৯২
অবনী মোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ)	শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর	৯৪
স্মৃতির আলোকে বিগতদিন থেকে	শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র	৯৬
অনন্তের খোঁজে	শ্রীমতী অরুনিমা বসুমল্লিক	১০১
নিষ্কাম আরাধনা	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	১০২
MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY A LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 02/07/2025 to 15/10/2025)		১০৪
AN APPEAL		১০৬
শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকার গ্রাহকবৃন্দের প্রতি		১০৭
Distributing Centres of Sree Sree Baleswari Patrika		১০৮
'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে'	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	১১১
পরম অধীশ্বর		১১৩

পরম শুভানুধ্যায়ী জনৈক শিষ্যা

সতাং প্রসঙ্গ

সময় ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৪, বিকাল পাঁচটা কলিকাতা আঠারোবাড়ীহাউস। জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ! শ্রীগুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ কি রূপ? এই বিষয়ে দয়া করে যদি কিছু উপদেশ করেন।"

অল্পকয়েকদিন পরেই তাঁর শুভজন্মোৎসব আসন্ন। সুসজ্জিত উৎসব মণ্ডপে চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীমহারাজ সমাসীন। প্রশ্ন শুনে তিনি অল্প কিছুকাল চুপকরে রইলেন, তারপর 'নির্ঝরের মত অবিরাম একতানে মধুর কণ্ঠে তাঁর শ্রীমুখের কথামৃতস্রোত প্রবাহিত করলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ:—"সৃষ্টির মধ্যে মহাশূন্যে প্রথমে স্রষ্টা নিঃসঙ্গ একা ছিলেন। কিন্তু পরে এই একাকীত্ব তিনি ভঙ্গ করলেন, কিরূপে? না নিজেই নিজের সৃষ্টির মাঝে বিচিত্ররূপে, বিচিত্র ভাবে অনুস্যূত হয়ে। নিজেই নিজেকে নানা রূপে সৃষ্টি করে। যিনি এক, তিনি নিজেই নিজেকে আস্বাদন করবার জন্য বহু হতে ইচ্ছা করলেন। এই ধ্যান, সৃষ্টির গোড়াকার কথা। তাই রূপ কল্পনাটি সেই ব্রহ্মেরই কল্পনা; মানুষের সৃষ্টি নয়। সৃষ্টির নানা পর্যায়ের পর ভগবান, আপনার আসন্ন প্রতিচ্ছবি করে পরিশেষে মানবকে সৃষ্টি করলেন। তাই এই মানব জীবন তাঁকে পাবার সকলের চেয়ে নিকটতম উপায়।

মানব যখন প্রথম সৃষ্ট হলো, তখনও সে তাঁরই প্রতিচ্ছবি স্বরূপ তাঁরই মত নিঃসঙ্গ, এক । তারও হৃদয়ে সেই অখণ্ড সত্তার একক সঙ্গহীন ভাব । কিন্তু কালক্রমে এই অখণ্ডবোধ এই বিশ্বচেতনা পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা বন্দী হয়ে ক্রমেই খণ্ডিত এবং বিচ্ছিন্ন হতে থাকলো। তখনই সে আপনার সেই স্বরূপগত স্বভাব বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত, নিঃসঙ্গভাব হারিয়ে ফেলে, অনেকের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে বসে থাকলো। যেমন একটি সরষের পুঁটলী—যতক্ষণ বাঁধা আছে, ঠিকই আছে । কিন্তু যখন এই বাঁধনখুলে অতিক্ষুদ্র অসংখ্য সরিষার দানাগুলি সর্ব্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের আবার একটি একটি করে কুড়িয়ে এনে বেঁধে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনও এই সরষের পুঁটলী। প্রথম যখন ভগবান তাকে আপনার প্রতিরূপ করে বিশ্বজগতে পাঠান তখন সে প্রেমের ডোরে, ভক্তির ডোরে, জ্ঞানরজ্জুর ডোরে এক জায়গায় বাঁধা ছিল। অর্থাৎ সেই পরম কারণের চরণতলে একীভূত হয়ে যুক্তছিল। কিন্তু জগতে এসে কালক্রমে সেই বন্ধন শিথিল হয়ে সে বহুর মধ্যে আপনাকে ছড়িয়ে ফেলে বসে আছে।

গুরু এসে শিষ্যের চেতনকে এই নানাত্বের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়ে, সকল আপাত বিভিন্ন বহুত্বের মাঝে সেই একের পরমপদ দর্শন করিয়ে দেন। গুরু শিষ্যকে নূতন কিছু দান করেন না। তিনি কেবল চেতনার অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেন। তিনি invent করেন না। তিনি মাত্র discovery করেন। অর্থাৎ নূতন কিছুই সৃষ্টি করেন না। যাহা চিরন্তন, কেবল তাহাই বাধা বিমুক্ত করে প্রকাশিত করে দেন।

যে অমৃতের অধিকারে আমাদের জন্মগত স্বত্ব, সেই হারানো বিস্মৃত স্বত্ববোধকে তিনি ফিরিয়ে আনেন। এইরূপেই সরষের পুঁটলী যখন খুলে চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তখন গুরুর সাহায্য ছাড়া মানব একাকী আপন চেষ্টায় আবার তাহা কুড়িয়ে এনে একের সেই অখণ্ড সত্তায় বিলীন করে দিতে সক্ষম হয় না। তাইজন্যে গুরুস্তোত্রে আছে:—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

সেই অখণ্ডমণ্ডলাকার,—যাঁর দ্বারা বিশ্বভুবনের সকল অণু রেণু ওতপ্রোত তাঁর পরমপদ শিষ্যকে দেখিয়ে দেবার কর্তা শ্রীগুরু। মণ্ডলাকার বলা হয়েছে কেন? বিশ্বের যত গতি সমস্তই এইরূপ মণ্ডলাকার। যদি আমাদের গতি এই রকম মণ্ডলাকার না হোত, যদি তা সরল রেখার মত সোজা হোত, তবে যে জীব একবার বন্ধনের মধ্যে পড়তো তার আর কখনই মুক্ত হবার আশা থাকত না। কিন্তু লীলাময় শ্রীভগবান তা করেন নি।

এ বিশ্বের সবই মণ্ডলাকার। যে কেন্দ্র বিন্দু হতে আমরা উৎপন্ন, যে দিক দিয়ে, যে ভাবে, যে পথে যে গতিতেই আমরা যাই না কেন, ঘুরে ফিরে সর্ব্বশেষে আবার ঠিক সেই কেন্দ্র বিন্দুতেই পৌঁছাতে হবে। মুক্তি আমাদের বার্থ-রাইট, (birth right) জন্ম স্বত্ব। যাত্রাপথের শেষে আমরা প্রত্যেকেই আবার আমাদের উৎপত্তিস্থল সেই আদি কারণের সঙ্গে একীভূত হবই। ত্রিভুবনে একটি অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে শুরু করে আকাশের কোটি ছায়াপথ, অগণ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী—সবের মধ্যেই সেই এক নিয়ম। এই অস্তিত্বের চক্রতলে এই চক্রাকার গতিতে বাঁধা পড়লে তার আর ছাড়ান নাই। যন্ত্র আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে অমোঘ নিয়মে। নদী পাহাড়ের উচ্চ শিখর হতে বহির্গত হয়ে কত দীর্ঘ বন্ধুর পথ কত ঊষর মরুভূমি কত দুর্গম গিরিউপত্যকা অতিক্রম করে অবশেষে মহাসমুদ্রে এসে মিশলো—তবু কি তার ছাড়ান আছে।

আবার সূর্য্যের প্রখর তাপে সমুদ্রের জলকণা বাষ্প হয়ে আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হলো। সেই মেঘের বর্ষণে, বারি প্রবাহের ধারায় পর্ব্বত শিখরের তুষার বিগলিত হয়ে পুনরায় নবনির্ঝরিণীর সৃষ্টি হয়ে, আবার স্রোতপথ বেয়ে তাহা চললো সমুদ্র পানে। এই চির আবর্তিত গতির ব্যূহ হতে আপন চেষ্টায় মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে না। মানবের এই জীবন যমুনাকে উজান পথে নিয়ে যেতে—বহুত্বের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়ে একের মাঝে বিলীন করে দিতে একমাত্র শ্রীগুরুই সক্ষম। শাস্ত্রে বলেছেন, গুরু তিন রকম। মানবৌঘ, দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ। প্রথমে মানবৌঘ গুরু। যাঁরা পবিত্র, শুদ্ধ, সত্ত্ব প্রধান যাঁরা শাস্ত্রানুমোদিত পথে চলে ভগবানকে এই জীবনেই উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা মানবৌঘ। এই দেহে তাঁদের সেবা তাঁদের সঙ্গ তাঁদের প্রসন্নতা অর্জ্জন করতে হয়। তারপর দিব্যৌঘ হলেন দেবতারা। আর সিদ্ধৌঘ হলেন চিন্ময়, ঘনীভুত সচ্চিদানন্দ। কিন্তু মানুষে কেবল ভাবময় চিন্ময় সত্তার সঙ্গে একেবারেই মিলিত হতে পারে না। তাই যদি সম্ভব হোত তবে বৈকুণ্ঠে বসে শ্রীভগবান সঙ্কল্পমাত্রে তাঁর চিন্ময় ভাব প্রবাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করে সকলকে উদ্ধার করে দিতেন। কিন্তু তাতে লীলা-ময়ের আনন্দ নাই। তাই ভগবানকে এই মরভূমিতে, মর্ত্ত জীবনের আধার ও বন্ধন স্বীকার করে অবতীর্ণ হতে হয়। যাহাতে আমরা তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করতে পারি। এই দেহেই দেহাতীত রূপে তাঁকে ধরতে বুঝতে পারি। তাঁর সেবা করে তাঁকে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করে শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে সকল অধ্যাত্ম- পথের সংশয় ছিন্ন করে নিতে পারি। তাইজন্যে এই মানব–জীবনই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান ত্রিভুবন মধ্যে। তিনি সকলের শেষে আপন প্রতিরূপ করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ নিত্য। গুরু যদি একবার শিষ্যকে গ্রহণ করেন তবে তাঁর আর অব্যাহতি নাই। করুণায় টলমল শ্রীমুখের পানে চেয়ে ভাবছিলাম, তাঁর এই অশ্রান্ত নামগান এই অক্লান্ত আত্মবিসর্জ্জন—এই অবিরাম করুণার নির্ঝর—এ' ও যেন তাঁর নিজের বিরহে নিজেরই ব্যাকুলতা। তাঁর অযোগ্য আত্মবিস্মৃত শিষ্যদের সঙ্গে তিনি মিলতে পারছেন না যে! নইলে তাঁরই অহেতুক করুণা ছাড়া জগতে এমন কোন প্রেম বা শক্তি আছে যে, সেই প্রেম-স্বরূপকে আবাহন করে আনে।

গীতার মর্ম (পরবর্তী অংশ)

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

প্রাণে অভয় জাগিয়ে দিতে, প্রাণকে চির অস্তিত্বের আভাসে আলোকিত করতে, 'মৃত্যু' শব্দ চিরদিনের জন্য বুকের ভিতর হতে মুছিয়ে দিতে শ্রীভগবান এইভাবেই আশ্বাসবাণী হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করেন, জীব যা কিছু দেখছে, যা কিছু অস্তিত্ব উপলব্ধি করছে, আছে বলে যাকিছু বুঝছে, এ সমস্তই চির সত্য-জন্মমৃত্যুহীন। আমিও চির বর্তমান, তুমিও চিরবর্তমান। এই ইন্দ্রিয়ভাবাদি, যাদের হননে তুমি কাতর হচ্ছিলে, যারা বিনষ্ট হবে ভেবে তুমি শোকাকুল হচ্ছিলে, এসকলও চির-বর্তমান এবং ঐ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত যে সকল পদার্থের জন্য তুমি মায়াক্রান্ত, সে সবও চিরবর্তমান।

তাই যদি হয়, তাহলে এই মুহূর্তে যা দেখছি, পরমুহূর্তে তা দেখতে পাই না কেন? আজ যেভাব আমার প্রাণের ভিতর ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, ইহজীবনে আর সে ভাবের সন্ধান পাইনা কেন? প্রাণ দিয়ে যাকে ভালবাসলাম, হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি যাঁর সেবায় অর্পন করলাম, যাঁর সঙ্গ মনুষ্য জীবনের চরিতার্থতা ভেবে মুহূর্তের জন্য ছাড়তে চাইতাম না কিছুকাল পরে আর সেই মনুষ্যরূপী গুরুকে সমগ্র জগৎ অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাই না কেন? প্রাণপনে কঠোর পরিশ্রম করে মাতৃরূপে ধ্যান করতে বসলাম, বহু কষ্টে, বহু আরাধনায় মূর্তি ফুটিয়ে তুললাম। মুহূর্তের জন্য মাতৃনয়নের স্নেহভরা চাহনি হৃদয়ে স্নেহের ধারা ঢেলে দিল, তারপর চরণে লুটোতে গিয়ে আর ত তাঁকে খুঁজে পেলাম না।

কেন অমন হয়? যদি সবই চিরস্থায়ী, তবে আমাদের সকলই অস্থায়ী কেন? যদি সকলই অপরিনামী তবে আমরা জগৎকে এত পরিনামী দেখছি কেন? তার উত্তর পাই পরের শ্লোকে, দেহিনোস্মিন যথা দেহে...(১৩)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে উপনিষদজ্ঞানের যেটি সর্বোত্তম সার বা রহস্য, সেই রহস্যটি বললেন। কেননা আচার্যতো কিছু কার্পণ্য করে বলেন না। আচার্য তাঁর সমস্যার একটা তাৎকালিক সমাধান করে দিয়ে নিস্তার খুঁজলেন না। তিনি চান জীবনের যে সমস্যা, সে সমস্যার যে মৌল সমাধান শিষ্যকে সে বিষয়ে অবহিত করতে। মনে রাখতে হবে একেই আমাদের দেশে বলা হয়েছে ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। এই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই খুঁজছি আমরা। নইলে তাৎখনিক দুঃখ নিবৃত্তির অনেক রকম উপায় আছে জগতে। অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার সঙ্গে অন্য জিজ্ঞাসার এখানেই তারতম্য।

আজকের দিনে পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞানের একটা আশ্চর্য অকল্পনীয় অগ্রগতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার মূল প্রেরণা দুঃখ নিবৃত্তি। মানুষ যেভাবে আজ আছে, আরও ভালভাবে সে থাকতে পারবে কিনা, নানারকম তার সে দুঃখ, সে দুঃখের লাঘব আরও করা যায় কিনা, তার সম্পদ বৃদ্ধি করে, উপকরণ বৃদ্ধি

করে— এই প্রয়াসে আজকের বিজ্ঞান নিরন্তর ব্যাপৃত। সুতরাং বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসাও দুঃখ নিবৃত্তির জিজ্ঞাসা; কিন্তু সেই দুঃখ নিবৃত্তি হচ্ছে তাৎকালিক মাত্র; সাময়িক মাত্র; পরিপূর্ণ দুঃখের নিবৃত্তি সে খুঁজে পাচ্ছে না। ঐকান্তিক মানে দুঃখ নিবৃত্তি হবেই। এই সুনিশ্চিত গ্যারান্টি চাই এবং (২) আত্যন্তিক, মানে দুঃখ নিবৃত্তি হবে চিরকালের মত।

আমাদের অসুখ হয়েছে ডাক্তারের কাছে গেলাম, তিনি আমাকে ওষুধ দিলেন। কিন্তু ওষুধ দিয়ে ভরসা দিতে পারলেন না যে জ্বরটা ছাড়বেই। আশা-ভরসা যদিওবা তিনি দেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ওষুধটা ঐকান্তিক। যদি চিকিৎসক অভিজ্ঞ হন এবং রোগটাকে ঠিক ঠিক নির্ণয় করে থাকেন, তাহলে তিনি বুঝবেন যে, এই ওষুধ পড়ামাত্রই রোগের নিবৃত্তি হবে। তাতে ঐকান্তিকতার হয়তো তিনি ভরসা দিলেন। তবে ঐকান্তিকতার ভরসা দিলেও আত্যন্তিকতার ভরসা পাইনা। মানে আজকের জ্বর কালকে ছেড়ে যাবার ভরসা দিলেন, ছেড়ে গেলও বটে, কিন্তু আবার যে সাতদিন পরে হবে না, একমাস পরে হবে না, একবছর পরে হবে না, কিংবা পাঁচ বছর পরে হবে না, কোনো দিন এ ভরসা কেউ দিতে পারে না। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির সেই জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে আধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা। এই অধ্যাত্মজিজ্ঞসার দিকে সেই জন্যই মানুষ ফেরে। জানতে চায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীর কাছে, এমন কোনো পথ তুমি বলতে পারো কিনা, এমন কোনো নির্দেশ তোমার কাছে আছে কিনা, যা মানুষকে তার দুঃখের হাত থেকে চিরকালের মত সুনিশ্চিত প্রাণ এনে দেবে। আর সেই দুঃখেরইবা কত না বিচিত্র রূপ-আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক।

সেই চিরকালের মতো ত্রাণ এনেদেবার জন্যই শ্রীভগবান অর্জুনকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিলেন আত্মজ্ঞান। এ কথা বলে দিলেন না যে যুদ্ধ করো, এটা করলেই তোমার ভালহবে, কিংবা যুদ্ধ করলে তোমার রাজ্য লাভ হবে, সুখ লাভ হবে। শুধু এইবলে তাকে উদ্বুদ্ধ করেও নিজের কর্তব্য শেষ করতে পারতেন। অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাঝে মাঝে সেইরকম কথাও শুনিয়েছেন। তুমি যদি যুদ্ধে জয়লাভ করো, তাহলে সসাগরা বসুন্ধরা ভোগ করতে পারবে কিংবা যদি হেরেও যাও বা নিহত হও, তাহলে স্বর্গে যাবে ইত্যাদি প্রলোভনও তিনি দেখিয়েছেন। সেই প্রলোভন দেখিয়ে তার মোহ বা ক্লৈব্য নিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের অবতারণা করলেন। তিনি দেখলেন অর্জুনের বিষাদ বা ক্লৈব্য একটা Symtom বা উপসর্গমাত্র। মূল রোগ হল অর্জুন মমতায় আবদ্ধ, যার মূলে আছে অহন্তা। তারই সমূলে উচ্ছেদ প্রয়োজন, আর তার সাধন হল আত্মজ্ঞান।

ক্রমশঃ

পুণ্য-পরশ-পুলক (২১শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

কান্তকবির ওই গানটার কথা মনে আছে? 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চূর', ওই গানের শেষ পংক্তিতে বলেছে , 'আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে গরব করিতে চূর'; শ্রীভগবানের এই লয়কারী, প্রলয়কারী লীলা যে কতবার দেখেছি তা বলার নয়।

ছোটবেলা থেকে গুরুমহারাজের ব্যাপারে আমরা এতই সহজ ছিলাম, এতই সহজ ভাবে তাঁকে দেখতাম যেন - আমরাই প্রধান, আর তিনি গৌণ। আমরা যাব প্রণাম করব, তিনি প্রণাম নেবেন, আমাদের কৃপা করবেন ইত্যাদি চিন্তাতেই আমাদের মতি আচ্ছন্ন থাকত। তিনি যে অত সহজলভ্য নন, তা কখনও ভাবতেই পারতাম না। তাই যে কোনও উপায়ে আমাদের ইতিবাচক ভাবনা অনুযায়ী কাজ না হলেই মহারাজের ওপর অভিমান হত। তাঁর প্রতি দোষারোপও করতাম। কিন্তু ভেবে দেখতাম না যে তিনি যা কিছু করছেন সবই আমাদের কল্যাণের জন্যে। গুরু যে রুদ্র রূপে আমাদেরই অশুভ বিনাশ করেন সেই ভাবনা সেই বুদ্ধি বিচার বোধ আমাদের ছিল না। তাই বারে বারে স্বার্থমগ্ন মনে আঘাত পেতে হয়েছে; আর বারে বারেই টের পেয়েছি তিনি না চাইলে কিছুই হয় না, এমনকি তাঁকে সাক্ষাৎ প্রণাম করা তো দুরস্ত, তাঁর দর্শন পাওয়া অসম্ভব।

একবার বণ্ডেল রোডে গুরুমহারাজ এসেছেন। সে সময় জায়গাটা আমাদের চেনা ছিল না। ট্রেনে হাওড়া যাওয়ার সময় লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানলাম শেয়ালদা থেকে ক্যানিং-এ নেমে সেখানে যেতে হয়। সেই মতো শেয়ালদা থেকে ক্যানিং-এ নেমে হাঁটা শুরু করলাম। দু পাশে চামড়া ট্যান করার গন্ধে নাক বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। তার মধ্যেই লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি। এ গলি ও গলি করে প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম। এবারে সেখান থেকে সেই নির্দিষ্ট বাড়িটি আর খুঁজে পাচ্ছি না। তার আগের নম্বর পাচ্ছি, আর পরের নম্বর পাচ্ছি। কিন্তু সেই বাড়িটা কোথায়? অগত্যা হতাশ হয়ে আমরা চারজন একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেতে খেতে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'ও গুরুদেব এসেছেন তো? ওই তো এই গলি দিয়ে চলে যান তা হলেই পেয়ে যাবেন।' ওমা! সত্যিই তাই! গলিটা দিয়ে ঢুকেই বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু তখনই সে বাড়িতে না ঢুকে আমরা কোন পথে ফিরব, সেটার খোঁজে গলির ও প্রান্তে একবার গিয়ে পৌঁছলাম। আর তখনই আমাদের অবাক হবার পালা, আরে এ বাড়ি তো আমাদের কলেজ যাবার চেনা রাস্তার ধারে, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি স্টপেজে।

সেবারে প্রণামের লাইনে দাঁড়ানোর পর অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের প্রণাম নিবেদন হয়ে গেল। তারপর কীর্তন শুনে বিকেল বেলা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাড়িটা চেনা হয়ে গেছে তাই পরের বছর আর কোনও অসুবিধা হল না। খুব সহজেই প্রণাম সেরে কীর্তন শুনে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু গোল বাধলো তার পরের কোনও এক বছরে।

বাড়িতে আমার পিসি পিসেমশাই এসেছেন। পিসির ইচ্ছে গুরুমহারাজকে দর্শন করেন। কিন্তু পিসেমশাই যেতে চান না। অবশেষে অনেক কথা কথান্তরের পর পিসেমশাই যেতে রাজি হলেন। কিন্তু পিসিকে তিনি নেবেন না, তিনি একাই যাবেন।

মা আমাকে বললেন, 'তুই পিসেমশাইকে নিয়ে গুরুমহারাজ দর্শন করে আয়।' কিন্তু পিসেমশায়ের কথা শুনে বুঝছি তিনি খুব একটা রাজি নন। এদিকে যাবার ইচ্ছেও আছে। আবার বললেন, 'ঠিক আছে আমি দীক্ষাও নিয়ে আসব।' মা বললেন, 'তোমার সময় না হলে তো দীক্ষা হবে না।' এই কথা শুনে তিনি এক চোট তর্ক করে নিলেন। পিসি বললেন, 'অত কথা বলছ কেন? তুমি তো আগে যাও।' পিসেমশাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতক্ষণ লাগবে?' আমিও বললাম, 'কতক্ষণ আর, নটা নাগাদ বেরোলে সাড়ে দশটা হবে পৌঁছতে, তারপর প্রণাম সেরে আবার ওই ধরুন দুটো নাগাদ ওখান থেকে বেরতে পারব।'

বাড়ি থেকে দুজনে মিলে রওনা হলাম। সাড়ে দশটা নাগাদ সে বাড়ি পৌঁছলাম। বেশ বড় লাইন পড়েছে প্রণামের। ঋষিদার থেকে দুজনে মালা কিনে প্রণামের লাইনে দাঁড়ালাম। এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল গুরুমহারাজের দেখা নেই। খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম, দীক্ষা হচ্ছে।

দীক্ষা পর্ব শেষ হল। গুরুমহারাজ ঘর থেকে বেরচ্ছেন সবাই গুরুমহারাজের জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ভাবলাম এবার প্রণাম শুরু হলে সাড়ে তিনটে চারটে নাগাদ আমাদের হয়ে যাবে। ওমা! মহারাজ প্রণাম নিতে না এসে একটা গাড়িতে চড়ে বসলেন। পাঁচটা গাড়ি তাঁর পিছু পিছু চললো। শুনলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি ফিরবেন। তারপর প্রণাম নেবেন গুরুমহারাজ ফিরলেন প্রায় সাড়ে চারটে। ফিরে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আবার ছটা নাগাদ বেরিয়ে গেলেন, ফিরলেন প্রায় আটটা। মহারাজকে ফিরতে দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম। যাক লাইন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে, এবার যদি প্রণাম নিতে বসেন, তা হলে অন্তত নটা সাড়ে নটার মধ্যে আমাদের প্রণাম হয়ে যাবে।

অপেক্ষা করতে করতে পিসেমশাই খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু নটা যখন বেজে গেল অথচ মহারাজ নামলেন না, তখনই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। তাঁকে নিয়ে এবার আমি কী করি! অগত্যা সিদ্ধান্ত নিলাম বাড়ি ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। তখন মালাগুলো মহারাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ব্যাগের মধ্যে নিয়ে ফেরার পথে বা বাড়ালাম। ক্ষণকালের জন্যে গুরুমহারাজের দর্শনটুকুই হয়েছে, প্রণাম করতে পারি নি, এ জন্যে খুবই খারাপ লাগছিল, অভিমানও হচ্ছিল। কিন্তু পিসেমশাই-এর অবস্থা আরও খারাপ। সারাদিন খাওয়া দাওয়া নেই, ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর মেজাজ তখন দিশাহারা। সারা রাস্তা তিনি মহারাজের ওপর রাগ দেখিয়ে চললেন, আর আমি চুপচাপ তাঁর কথা শুনতে শুনতে নিজের অপরাধ স্খালনের জন্যে ইষ্টনাম জপ করতে করতে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি ফিরেই পিসেমশাই রাগে ফেটে পড়লেন। মা বললেন, তোমাকে তো তখনই বলেছিলাম, গুরুমহারাজ অন্তর্যামী। তুমি এখানে যা বলছ, সব তিনি শুনতে পাচ্ছেন। খোকন একবার বলেছিল, 'মালা কিনে কী হবে? মহারাজ তো আমাদের মালা আমাদেরই ফেরত দিয়ে দেন।' কিন্তু সেদিন বাকি সবাই আশীর্বাদী মালা পেলেও খোকন পায় নি।'

তারপর পিসেমশাইয়ের গজগজানি কতক্ষণ চলেছিল সে আর মনে নেই, তবে আশ্চর্য এই যে, সে রাতে আমার মনে কোনো ক্ষোভ অভিমান কিছুই জাগে নি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী ভক্তের অনুভূতিতে-দ্বিতীয়পর্বের শেষাংশ

শ্রী সোমনাথ সরকার

সন্তানহীন দম্পতি মনোকষ্টে দুজনে পরামর্শ করে গ্রামের অনতিদূরে বৃষ পর্বতে মহাজাগ্রত চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের মন্দিরে ব্রতধারণপূর্বক শিবের আরাধনা করতে লাগলেন। প্রথমে কিছুদিন কন্দমূল ভক্ষন করে, পরে শুধুমাত্র শিবের চরণামৃত পান করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

তাঁদের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একরাত্রে দেবাদিদেব মহাদেব শিবগুরুকে স্বপ্নে জ্যোতির্ময় রূপধারণ করে দেখা দিয়ে বললেন—" বৎস শিবগুরু, তোমাদের তপস্যা ও ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। এখন বলো তোমার কী প্রার্থনা? তোমাকে অভীষ্ট দান করার জন্য আমি আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি।"

শিবগুরু দেবাদিদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে জানালেন, "দেব, আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমায় একটি দীর্ঘায়ু সর্বজ্ঞ পুত্র প্রদান করুন।"

সনাতন ধর্মের দুর্দিন দেখে ভগবান শঙ্কর বোধহয় নিজেই অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা করেছিলেন।

শিবগুরুর প্রার্থনা শুনে দেবাদিদেব বললেন— "বৎস! সর্বজ্ঞ পুত্র চাইলে সে দীর্ঘায়ু হবে না। আর দীর্ঘায়ু পুত্র চাইলে হবে না সর্বজ্ঞ। এখন বলো কী প্রকার পুত্র চাও? সর্বজ্ঞ না দীর্ঘায়ু?"

শিবগুরু প্রার্থনা জানালেন সর্বজ্ঞ পুত্রের। মহাদেব বরদান করে বললেন— "তোমার কামনা পূর্ণ হবে। সর্বজ্ঞ পুত্র তুমি লাভ করবে। আমি স্বয়ং তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হব। আর তপস্যা করতে হবে না সহধর্মিনীকে নিয়ে গৃহে ফিরে যাও।"

স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে শিবগুরু ও বিশিষ্টা দেবী আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পবিত্র হৃদয়ে শিবপূজা করে কালাতিপাত করতে লাগলেন।

যথাসময়ে ৬৮৬ সালের ১২ই বৈশাখ শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে শুভ মধ্যাহ্নে বিশিষ্টা দেবীর কোল আলো করে দেবরূপী শিশু শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন।

(শঙ্করের জন্মের সন তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে ৭৮৮ সালের বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমীতে শঙ্করের জন্ম। বর্তমানে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মঠ ও আখড়া শুক্লা পঞ্চমী তিথিকে শঙ্করের আবির্ভাব তিথি হিসাবে মানেন)।

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে আছে যে মহাদেবের অংশে শঙ্কর যখন জন্মগ্রহণ করেন তার আশেপাশের সময়ে বিষ্ণুর অংশে পদ্মপাদ, পবনদেবের অংশে হস্তামলক ও ব্রহ্মার অংশে সুরেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন।

অতি শৈশব থেকেই শঙ্কর শান্তপ্রকৃতির তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও শ্রুতিধর ছিলেন। পিতা শিবগুরুর ইচ্ছা

ছিল তিনি পঞ্চমবর্ষে শঙ্করকে উপনয়ন দিয়ে গুরুগৃহে বেদপাঠে পাঠাবেন।

কিন্তু বিধাতার কী বিচিত্র বিচার। শঙ্করের তিন বৎসর বয়সেই পিতা শিবগুরু অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। আকস্মিক শোকে বিহ্বলা বিশিষ্টা দেবী পতিদেবতার পারলৌকিক কার্য্যাদি কোনও রকমে সম্পন্ন করে শিশুপুত্র শঙ্করকে নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু মৃত পতির সংকল্প স্মরণ করে শঙ্করের পঞ্চম বর্ষ বয়সে আবার স্বগৃহে ফিরে আসলেন। এক শুভদিন দেখে তিনি শঙ্করের উপনয়ণ দিলেন এবং বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করলেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও সুস্বভাবের কারণে শঙ্কর অতিশীঘ্র গুরুগৃহে গুরুর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলেন অপরাপর শিষ্য গণের অপেক্ষা অতিদ্রুত মাত্র দুই বৎসরেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ণের পাঠ সম্পূর্ণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শঙ্করের মাতা শঙ্করের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। শঙ্কর কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁকে নিরস্ত্র করে ব্রহ্মাচর্য্য পালন করতে লাগলেন। একদিন কয়েকজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ শঙ্করের গৃহে আগমন করেন। শঙ্কর ও শঙ্করের মাতা যথোচিত সম্মানের সঙ্গে অতিথি আপ্যায়ণ করেন। পরে শঙ্করের মাতা তাঁদের শঙ্করের জন্মপত্রিকা দেখান। তাঁরা সেটা দেখে জানান শঙ্করের জন্মে অবতার যোগ আছে; তবে তিনি স্বল্পায়ু। শঙ্করের অষ্টম, ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশ বর্ষে মৃত্যু যোগ রয়েছে।

ব্রাহ্মনেরা এরপর সেখান থেকে চলে যান। তাঁরা ফিরে গেলে শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন এবং তাঁর মাতৃদেবীকে সেকথা জানান কেননা সন্ন্যাস ব্যতিত তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যাবে না আর জ্ঞান লাভ না হলে মুক্তিও সম্ভব নয়। শঙ্করের মাতা তাতে নারাজ হলেন, বললেন, ‘‘তুমি এখন সবে আটবছরের বালক, আমি মারা গেলে সন্ন্যাস নিও।’’

একদিন শঙ্কর মাতার সঙ্গে আলোয়াই নদীতে স্নান করতে গেছেন। হঠাৎ শঙ্করকে কুম্ভীরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। শঙ্কর তখন চীৎকার করে মাকে বললেন— ‘‘মা, আমায় কুমীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।’’ বিশিষ্টাদেবী সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলের হাত টেনে ধরলেন। ঘাটে আরও কয়েকজন স্নান করছিল, তারাও শঙ্করকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিল। বিরাট কুমীর কিন্তু শঙ্করকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। শঙ্কর তখন মায়ের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, ‘‘আপনি তো আমাকে সন্ন্যাস নিতে দিলেন না; এখন সন্ন্যাস ছাড়া মৃত্যু হলে আমি মুক্তি পাবো না। আপনি যদি এখনও অনুমতি দেন তাহলে ভগবানকে স্মরণ করে আমি অন্তিম সন্ন্যাস নিলেও মুক্তি পাব।’’

বিশিষ্টা দেবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘‘তাই হোক বাবা, আমি অনুমতি দিচ্ছি। তুমি সন্ন্যাসী হও।’’

পাশের ঘাটে কয়েকজন মৎস্যজীবি মাছ ধরছিল। তারা মাছ ধরার জাল নিয়ে ছুটে এলেন। কুমীরের ওপর জাল ছুঁড়ে দিয়ে সকলে মিলে টানতে টানতে কুমীরকে ডাঙায় তুললেন। শঙ্কর ও বিশিষ্টা দেবীকেও টেনে তীরে তোলা হল। বিশিষ্টাদেবী তখনও মূর্ছিতা। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলেন। গ্রামবাসীরা দুজনকেই গৃহে নিয়ে এলো। শঙ্কর মাতাকে বললেন, ‘‘মা, এখনতো আমি সন্ন্যাসী; আমিতো গৃহে বাস করতে পারি না। শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বগৃহে বাস নিষিদ্ধ।’’

(তথ্যসূত্র— শঙ্করের জীবনের কিছু তথ্যের জন্য স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরীর আচার্য শঙ্কর গ্রন্থ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত।)

অবনী মোহনিয়া মোহনানন্দজী

শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর (পরবর্তী অংশ)

এদিকে মহারাজজীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী হলো অবনীমোহনের, চোখে কী পড়লো ধুলো বা বালির কণা,— কেন চোখ ভ'রে আসে বার বার,— 'কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের নীরে'! বন্ধুজনের সামনে এ'কী অস্বস্তি' তাঁর উৎসাহেই তো এসেছেন আর সবাই। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কৃপা চায় যেন আত্ম গরিমা।

কী যে ঘটে গেল মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে? সে কি কোনো অতিঘটনা, কোনো মিনি মিরাকল? গয়ায় কৃষ্ণ পদচিহ্ন দেখে বিভোর নিমাই পণ্ডিত... অশ্ব উৎক্ষিপত সল কখন হ'য়ে গেলেন পৌল... লালাবাবুর কানের কাছে কে বলতে বলতে গেল, 'বেলা যে যায়...'। যা হলো তা এতো বড় কিছু হয়তো নয়, তবু একটি ক্ষণ কাঁপিয়ে দিতে পারে এতোদিনের জীবনযাপন। Doubting Thomas বা আমদের জগাই মাধাইয়ের পরিবর্তন তো উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়।

ডাকসাইটে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজকর্মচারী অবনীমোহন, ধমনীতে বইছে কত পুরুষের জমিদারী রক্ত। নাম শুনলে, গলার আওয়াজ কানে গেলে মানুষ থর থর করে কাঁপে,— বিশেষত গোলমেলে কোনো কিছুতে যদি হাত থাকে তাদের। রীতিমত সমীহ ক'রে চলেন সমপর্যায়ের বা একটু কমবয়সী অফিসারেরা,— এমন কী উর্ধ্বতনরাও। ... চায়ের নেমন্তন্ন আছে, অথচ বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, ভদ্রলোকের দেখা নেই। ফোন তুলে একেবারে হুমকি দিয়ে উঠলেন অবনীমোহন; 'Shom! I had invited you to tea and not to dinner!' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের জন্য বড়াখানার ব্যবস্থা হয়েছে, গভরনরস্ হাউসের বিশাল লনে। সংক্ষিপ্ত ভাষণে গভর্নর কৃতজ্ঞতা জানালেন যুদ্ধ প্রত্যাগতদের। সবকিছু তদারক করার সময় অবনীমোহন দেখেন কী ইংরেজ আর ভারতীয় সৈন্যদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা আলাদা। ইংরেজদের দেওয়া হচ্ছে চিনি মেশানো চা, আর ভারতীয়দের চায়ে গুড়। দেখেই অবনীমোহনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করে ছিলেন গভর্নর পত্নী। পরাধীন দেশ— শাসক, তস্যপত্নী, বিদেশী দুজনেই। সে-সবের তোয়াক্কা না করে এক লাথিতে উল্টে ফেলে দিলেন চায়ের সকল সরঞ্জাম। ফল আন্দাজ করে বাড়িতে ফিরেই পাঠিয়ে দিলেন পদত্যাগ পত্র,— যদিও পুরো সংসারের দায় তাঁরই। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এত সামান্য কারণে হারাতে চাইলেন না অবনী মোহনের মতো সুদক্ষ একজন মানুষকে। এরফল হল এই যে উনিতো কাজে বহাল রইলেনই— বৈষম্যনীতির জন্য বকুনি খেলেন শাসক পত্নীই! এরপর স্বাধীন দেশ। স্থানীয় ব্যবসায়ী বর্গ বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে পেশ হবেন দেশী শাসক বর্গের কাছে। ছুটির দিন সকালবেলা— ভৃত্য এসে খবর দিল, 'কেডায় য্যান আইছইন'। অবনীমোহনের হাতে সে সময় সরবরাহ দপ্তরের ভার। এসে দেখনে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে জোড় হস্ত এক ব্যবসায়ী।

বলছে, 'গোড় লাগি সাব। একটু নজরানা লেকে আয়া হু'। ... হামার একঠো কাম থা, সাব।' এদিক ওদিক তাকিয়ে অবনীমোহন দেখেন কে একজন চাকরপানা লোক শাক-সবজি, ফল ভর্তি বিশাল এক ঝাঁকা নামিয়ে রাখছে সিঁড়ির নীচের ধাপটায়। দাঁত কিড় মিড় করতে করতে নেমে এলেন অবনীমোহন। মুখে কোনো কথা নেই। যৌবনে ভালো ফুটবল খেলতেন। এবার বার হয়ে এলো সেই পুরনো ম্যাজিকের এক ঝলক। সবজি-ফলের ঝাঁকাটা ইউ, এফ, ওর মতো বেশ খানিকটা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে হাওয়ায় পাক খেতে খেতে ধড়াম করে গিয়ে পড়লো সিঁড়ি টপকে বাগানের কাছে। একটা পূর্ণিমা সাইজ কুমড়ো গড়িয়ে গড়িয়ে এসে আটকে গেল জিনিয়া বেডের ধারে।... বটানীর ছাত্র অবনীমোহন খুব বাগান শৌখিনও বটে।... ঘুরে তাকাতেই দেখলেন ব্যবসায়ী আর সাগরেদ। —অর্ধ্ব মুক্ত কচ্ছ,— পোঁ পা পালাচ্ছে লোহার গেটটা খুলে।

নীচে নেমে এসে দেখলেন জিনিয়া অক্ষত আছে কিনা। অফিসের বাইরে বাড়িতেও যথেষ্ট রাশভারী অবনীমোহন। যতক্ষণ না অফিসের জন্য বার হয়ে যাচ্ছেন, একেবারে তটস্থ বাড়ির সবাই। অফিস থেকে ফিরে চা-পর্ব শেষ করেই সোজা নেমে পড়েন তাঁর সুসজ্জিত বাগানে। বটানীর মেধাবী ছাত্র অবনীমোহন বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নানা রঙের এবং নানা ধরনের ফুল ফোটানোর চেষ্টা করতেন তাঁর লাস্যুমিয়রের বাগানে— সে বাগানের শোভাই ছিল অন্যরকম। ফুলের পাশেই ছিল ফল সবজির ক্ষেত। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে তৈরি তাঁর বাড়ির নাম ছিল 'মোহনানন্দে'।

এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্পন্ন মানুষ যিনি মহিলা মহলকে বিশেষ পাত্তা দেবেন না, সেটাইতো স্বাভাবিক। স্ত্রী লতিকা কুমিল্লার বিখ্যাত বর্ধন পরিবারের মেয়ে। ব্যক্তিত্বও যথেষ্ট প্রখর। তবুও জোরালো এই পতিদেবতার কাছে নিজেকে অনেকটাই সংযত ও অনুগত করে রাখতেন। সেতো যেমন তেমন তবে একী উল্টো হাওয়া? জবরদস্ত পতিদেবতা স্ত্রীর সঙ্গে নরমসুরে কথা বলছেন— আর বিষয়? সেটাতো আরও অবাক হবার মত: জিজ্ঞেস করছেন শিলং আগত নতুন সন্ন্যাসীর কথা, বর্ণনা করছেন কোলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ হোস্টেলে তাঁর আদি পর্ব। বলতে বলতে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসে চোখ-গলায় এক অজানা বিহ্বলতা। শেষ পর্যন্ত লতিকাদেবী বলেই ফেললেন, 'চলো নাগো একদিন আমার সঙ্গে।'

তাজ্জব, যা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য, তাই ঘটল এবার। মহারাজজীর সান্ধ্য কীর্তনে স্ত্রীর সঙ্গে যেতে শুরু করলেন অবনীমোহন, সঙ্গে দু-একজন একদা অবিশ্বাসী সঙ্গীও—তাঁরা যে অবনীমোহনেরই অনুগামী কী রাজদ্বারে, কী শ্মশানে! নিভৃতে কথাও হয় মহারাজজীর সঙ্গে। তারপর একদিন ওঁরা বেশ কয়েকজন— মধুসূদনদার ভাষায়— ধন্য হলেন। কী রকম ধন্য? মহারাজজীর কাছে দীক্ষা নিলেন অবনীমোহন আর লতিকা। বন্ধু স্থানীয় কিছু মানুষও দীক্ষিত হলেন এরপর হরিসভানিবাসী মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়। পূজা, জপ, তপ— আধ্যাত্মিকতার যাবতীয় প্রকরণ— জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গভীর নিষ্ঠায় পালন করে গেছেন এঁরা সকলে। এখানে উল্লেখ্য মনোরঞ্জন চৌধুরীর 'যুগল মহাপুরুষ', প্রকাশ পেয়েছে উত্তরকালে আর অবনীমোহন রচিত কয়েকটি গান স্থান পেয়েছে, 'অমৃত লহরী'তে। এ মহা সৌভাগ্যের কথা।

ক্রমশঃ

স্মৃতির আলোকে বিগতদিন থেকে

শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

যাক যে প্রসঙ্গে লিখছিলাম। সেখানে ফিরে যাই। আমি মেদিনীপুরে সকাল ন'টার মধ্যে পৌঁছেছিলাম। তখন দীঘা যাওয়ার প্রস্তুতি শেষ। বোধহয় দশটার মধ্যে আমরা দীঘার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। একটা বাস ভর্তি লোক গিয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে স্থান পাবার।

মহারাজজী ছিলেন একটা ভ্যানে। বাঁকুড়ার অসিতদা, আমি, টুনটুন (ব্যোম- কেশদার কন্যা) মহারাজজী ও ড্রাইভার সে গাড়ীর আরোহী ছিলাম। সেবারেই আমার প্রথম দীঘা ভ্রমণ। মহারাজজী যে কত জায়গায় নিয়ে গেছেন, কত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দেখিয়েছেন, আজ শেষ বয়সে শুধু সেই চিন্তা করি ও মহারাজজীকে স্মরণ করি। দীঘার সেবারের আনন্দের কোনো তুলনা নেই। মনে পড়ে যাচ্ছে সেইখানে একদিন রাত্রে কীর্তন আসরে কথাবার্তার সময় মহারাজজী হঠাৎ অসিতদাকে বলেন যে "ভীষ্মকে তোমাদের সঙ্গে ব্যবসায় নিয়ে নাও না।" অবশ্য পরে আর সে নিয়ে আমিও অসিতদাকে বলিনি বা অসিতদাও গা করেন নি। সে সময় অসিতদা, সুভাষের (গাইন) সঙ্গে বিরাট ব্যবসায় যুক্ত ছিল।

সে সময়ের দীঘার সঙ্গে আজকের দীঘার কোনো সাদৃশ্য, কোন মিল নেই। সে সময়ে সবে কিছু কিছু ঘরবাড়ী গড়ে উঠেছে। আমাদের মনে আছে ঝাউবনের ভিতর বসে কীর্তন হয়েছিল। আজকাল সে সব ঝাউ গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ কানে এল, মেদিনীপুরের শিশুরা, সঙ্গে বড় দুই-একজন কিছুটা বড় বয়সে তাদের তুলনায়, সকলে একসঙ্গে মহারাজজীকে বার বার বলছে "গল্প বলুন মহারাজ? সেবারে গল্পের পরে কি হল বলুন মহারাজ।"

আমার পরম সৌভাগ্য যে সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে। মহারাজজী দীঘা আসতে না বললে তো আমি আসতামই না। যাই হোক মহারাজজীর বলা গল্পটি টুনটুনের ভাষায় জানাবার চেষ্টা করছি—

সেদিন ২১শে জুন ১৯৬০ সাল, মেদিনীপুরে একটি রাত। কীর্তন শেষে আমরা ভাই-বোনেরা মহারাজকে ধরে বসলাম : "মহারাজ একটা গল্প বলুন।" মহারাজ কিছুই বললেন না। অথচ তাঁর কাছ থেকে গল্প শুনবো এ আমাদের অনেকদিনের একান্ত কামনা। আমরা তাই বার বার আমাদের দাবী জানাতে লাগলাম— 'গল্প বলুন।' আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে মহারাজ বলতে সুরু করলেন—

"এক যে ছিল রাজা
তাঁর ছিল অনেক প্রজা
তারা কেউ ছিল না মোটেই সোজা
তাদের মাথায় চাপিয়ে দিল খড়ের বোঝা।"

এই পর্যন্ত বলে শিশুসুলভ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর প্রসন্ন শ্রীমুখ। আবার ৮. ৭. ৬১ তারিখে মেদিনীপুরের—

আমরা— "গল্প শুনবো মহারাজ।"

মহারাজ— "আগের গল্পটা মনে আছে? বলো দেখি।"

আমরা মুখস্থ বলে গেলাম। মহারাজ পূর্বাংশের পর থেকে বলতে লাগলেন—

"বোঝায় লাগলো আগুন
মাস ছিল তায় ফাগুন
তাতে পুড়িয়ে খেল বেগুন।
বেগুন খেয়ে ধরলো পেটে ব্যথা
ডাক্তার হল রুগী, ওষুধ পাবে কোথা?
সবাই রাজার কাছে করলো নালিশ
রাজা বললো, 'নিয়ে এস এক একটা বালিশ'
সেই বালিশে মাথা দিয়ে শুলে
ক্ষুধা তৃষ্ণা রবে না
বৈকুণ্ঠে চলে যাবে
ভাবনা চিন্তা থাকবে না"

পরের দিন রাত্রে ৯. ৭. ৬১ তারিখে আমাদের আব্দারের পুনরাবৃত্তি।

মহারাজ সেই আব্দার রাখলেন— আবার সুরু হ'ল গল্প-বলা—

"রাজা ভুলে প্রজার বালিশে শু'ল
রাজা-প্রজা উভয়েই বৈকুণ্ঠে গেল।
রাজা গেল, প্রজা গেল, কেউ আর থাকলো না
গল্প বলা শেষ হ'ল আর বলতে বলো না।"

স্থান দীঘার সমুদ্র-সৈকত, ১১.৭.৬১ তারিখের বিকালবেলা। বালুবেলায় সবাই বসে আছি। আমরা আগের মত গল্প বলার জন্য মহারাজকে ধরে বসেছি।

মহারাজ— মেদিনীপুরে তো গল্প বলেছি। বলেছি না—
"গল্প বলা শেষ হ'ল, আর বলতে বলো না।"

আমরা— "গল্প বলার শেষ-- সে তো মেদিনীপুরে। দীঘায় গল্প বলতে হ'বে।"

মহারাজ— গল্প বলা সকল বলা শেষ, আর বলা হবে না।
'বল', 'বল', 'বল', বলে আর বিরক্ত কোরো না।

আমরা— এরকম গল্প নয়, বড় গল্প শুনবো।

মহারাজ—

আষাঢ় মাসে গেলাম দীঘা
জমি কিনলাম দুইটি বিঘা
তৈরী করলাম মস্ত বাড়ী

গ্যারেজে রাখলাম মস্ত গাড়ী।
সমুদ্র-তটে গিয়েছি শুতে
যেই শুয়েছি পাটি পেতে
গায়ের মধ্যে ঢুকলো পোকা
চাকরকে বললাম, "ওরে বোকা"।
ধমক দিয়ে বললাম তাকে
পোকা এল কোথা থেকে?
উঠে দেখলাম মস্ত কাঁকড়া
চাকরকে বল্লাম 'জলদি পাকড়া'
ভাতের সঙ্গে খেয়ে তারে
কলকাতা যাবে ফিরে।

মহারাজ পরের দিন কলকাতায় ফিরে যাবেন। আমাদের মন খুবই বিষণ্ণ। তাই কবিতায় কলকাতার যাওয়ার কথাটা আমাদের ভাল লাগেনি। এইজন্যে আমরা মহারাজকে বললাম—

"মেদিনীপুরের কথা বলুন। কলকাতায় যাওয়ার কথা বলবেন না।"

মহারাজ তখন বললেন— "ভাতের সঙ্গে খেয়ে তারে'-এর বদলে করো—

"খেয়ে তারে ভাতের সনে
মেদিনীপুর যাও আনন্দ মনে।"

তারপর খুব হেসে যোগ করে দিলেন কটি ছত্র—

"কথা বলা, গল্প বলা এখানেতেই শেষ
মুগ্ধ শ্রোতা সবাই বল বাঃ বেশ বেশ।
গল্পসুন্দর কবিতাটি পড়লে তুমি নিত্য
বিশ্বকবির মত কবি হবে তুমি সত্য!

হাসতে হাসতে অবশেষে মহারাজ বললেন—"গল্প দুটো প্রবাসী, ভারতবর্ষে ছাপিয়ে দিও।"

(এর পরের ঘটনাটি বা গল্প বলা আমার সৌভাগ্যে আমার উপস্থিতিতে হয়েছিল।)

সেদিন ১৮. ১. ৬৩ সাল।

দীঘার সমুদ্র তীরের ঝাউবন। সেখানে চলেছে আলো-ছায়ার খেলা। দেখা যাচ্ছে দিগন্ত প্রসারী সমুদ্রের নীলিমা—শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের অশান্ত গর্জন। সুন্দর পরিবেশ সুন্দরতম হয়েছে আমাদের মহারাজের আগমনে। একটি ঝাউগাছের তলায় বসেছেন মহারাজ। তাঁকে ঘিরে বসেছি আমরা।

বয়সের বিচারে যদিও আমরা শিশুর সমপর্যায়ে আসিনা তবু চির শিশুর সান্নিধ্যে এসে আমরা ভুলে গেছি বয়সের গাম্ভীর্য। এই শিশুর দল তাদের পুরাতন আব্দার করে বসলো মহারাজের কাছে— দাদাজীর কাছে যিনি শিশুর মনে শিশুর মতো গল্প করেন—"মহারাজ, গল্প শুনবো। দাদাজী গল্প বলুন।"

মহারাজের গল্প লিখে রাখবো বলে কাগজ কলম নিয়ে গেছি। নইলে গল্পটা মুখস্থ করে ফিরে এসে

লিখতে হবে। মনে ভয় আছে যদি ভুলে যাই তাঁর গল্পের একটি শব্দ তাহলে যে হারাব সুধা-সমুদ্রের অমূল্য একটি কণা। তাই কাগজ-কলম নিয়ে আমি প্রস্তুত। মহারাজ কিন্তু নীরব অথচ আমরা গল্প শোনবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল। তাঁর অধরে দেখতে পেলাম মৃদু হাসির রেখা। তা দেখে আমরা ভাই, বোনেরা উল্লসিত, আশ্বস্ত। এবার তিনি নিশ্চয়ই গল্প বলবেন। কাগজের দিকে তাকালেন মহারাজ—হাসলেন—সেই হাসি ছড়িয়ে গেল সবখানে। মহারাজ সুরু করলেন—

দেড় বছর পরে এলাম আমি মেদিনীপুর
পীচ-ভরা দুই রাস্তার পাশ ধূলায় ভরপুর।
রাস্তা ছেড়ে মাঠে গেলাম
লাগলো পায়ে কাঁটা
মিত্তির বাড়ীর দশটা মেয়ে
আনলো দশটা ঝাঁটা।

এখানে আমরা অর্থাৎ মিত্তির বাড়ীর মেয়েরা চুপ করে থাকতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আমাদের 'ঝাঁটাহস্তা' করলেন মহারাজ। তিনি খুব হাসছেন আমরাও হাসছি—তবু তার মাঝে সরব প্রতিবাদ করছি—"আমাদের হাতে ঝাঁটা দেওয়া চলবে না।" হাসি থামলে তিনি বলতে লাগলেন—

"কাঁটাবনে ঝাঁটা দিতে
উড়লো বিষম ধূলি
নাকে হাঁচি গলায় কাসি
নাইক' মুখে বুলি।
তাড়াতাড়ি সবাই গেল
আনতে ডাক্তার বৈদ্যি
মেদিনীপুরের ডাক্তার-বৈদ্যির
শোন কেমন বুদ্ধি।
ডাক্তারবাবু নিড্‌ল নিলেন
দিতে ইনজেকসান
সেই লম্বা নিড্‌ল দেখে
যায় বুঝি মোর প্রাণ।
তখন তাড়াতাড়ি মোটর চড়ে
গেলাম বাঁকুড়া
সেখানে গিয়ে বাঁচলো প্রাণ
খেয়ে মুড়ি-চিঁড়া।
ঝাউবনেতে বসে বসে
খাচ্ছি ডাব যখন
এই গল্প শেষ হইল
চলো ঘরে এখন।"

মেদিনীপুরে ফিরে এসে কীর্তন শেষে মহারাজকে বললাম "কবিতায় মিত্তির বাড়ীর ছেলেগুলো যে স্থান পেল না মহারাজ।" প্রসাদ দিচ্ছিলেন মহারাজ। হাসতে হাসতে বললেন—

"মিত্তির বাড়ীর ছেলেগুলো
এক একটি রত্ন
যখন আমি আসি
আমায় কতই করে যত্ন।"

মহারাজের কাছ হতে এরকম প্রশংসা পেয়ে মিত্তির বাড়ী দুটি রত্ন খুবই গর্বিত হয়ে 'ঝাঁটাহস্তা' দশটি বোনের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। বলাবাহুল্য মহারাজ এতে খুব হাসছিলেন। বোনেদের কথা কি আর বলব। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া গেলেন। 'ওখানে কড়র পাহাড়ে' উঠতে উঠতে মহারাজ নিজে থেকেই সুরু করলেন—

"মেদিনীপুর ছেড়ে বাঁকুড়ায় এলাম চলি
এখানেও এসে দেখলাম ভয়ানক ধূলি
নাকে হাঁচি গলায় কাসি
চোখ পারিনা চাহিতে
মিত্তিরদের মেয়েরা গেল
বৈদ্যরাজ ডাকিতে।
হাঁচির জন্য বৈদ্য দিলেন
হাঁচি হুতাশন
কাসির জন্য বার করিলেন
চ্যাবন প্রাশন।

এর এক এক কণাও যেন হারিয়ে না যায় সেটাই আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিৎ বলে মনে করি। সেটিও এই রচনার মাঝে সন্নিবেশিত করে গেলাম।—

নিদ্রায় দেখিনু হায় মধুর স্বপন
কি সুন্দর সুখময় মানব জীবন—
জাগিয়া মেলিনু আঁখি চমকিয়া পুনঃ দেখি,
কঠোর কর্তব্য ব্রত জীবন যাপন।"

ক্রমশঃ

অনন্তের খোঁজে

শ্রীমতী অরুনিমা বসুমল্লিক

চক্ষু তোমারে খোঁজে চারিধার
মন যে তোমারে চায়,
বলো মোরে বলো কী নামে ডাকিলে
সবে, তোমা সাড়া পায়।
কত যে তোমার লীলাখেলা প্রভু
অন্ত নাহি যে তার,
আমি শুধু ঘুরি কেঁদে কেঁদে মরি,
সমুখে অকূল পাথার।
অন্তর নিঙারি পারিনা ডাকিতে
শিখাও সে ডাক প্রভু;
হায় এ জনম যে বৃথা চলে যায়
পাব না কী আর পরশ কভু।
আর খেলোনা লুকোচুরি খেলা
শিখাও মোরে সে নাম,
যে নামেতে হইবে ঐ চরণ দরশন,
পুরিবে মনস্কাম।
দিওনা এ জনম চলে যেতে বৃথা
বলো মোরে বলো তোমারে পাইব কোথা,
হে গুরু মহারাজ করি সদা তোমারে স্মরণ
বন্দনা গানে অশ্রুজলে পূজিব তোমার শ্রীচরণ।।

নিষ্কাম আরাধনা

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী আমাদের ভুবন ভরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের মনে যা প্রশ্ন আসতো কীর্তনের মাঝেই তার উত্তর পেয়ে যেতাম। বড় মহারাজজীর ধরণ ছিল একটু আলাদা। তিনি শিশুদের গল্প শোনানোর মত করে ভক্ত শিষ্যদের উত্তর দিতে ভালবাসতেন, তাঁর দুই সুযোগ্যা শিষ্যা সেই মধুর গল্পগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন বলেই না আমরা এখনো সেই রসাস্বাদন করতে পারছি। লিখতে বসলে যখনি সংশয় বা বিপদে পড়ি, তখনই বড় মহারাজের শরণ নিই, ওনার সদাহাস্যময় মুখে সর্বদাই বরাভয়কর হাসি। এবারও তাই সতাং প্রসঙ্গ খুলতেই বেরিয়ে এল নিষ্কামী রাণীর গল্প। আমার গল্পের বিষয় তাই নিষ্কাম আরাধনা।" প্রথমে এ প্রসঙ্গে বড় মহারাজের গল্পটি বলি, কথা প্রসঙ্গ ৬.৬ পাতায় এই গল্পটি আছে।

কোন একদেশে এক সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন। হঠাৎ অপর এক রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে রাজা তার রাণীদের কাছে জানতে চাইলেন, তারা কে কি চান। সব রাণীরা তাদের ইচ্ছে মতো ফর্দ পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু ছোটরাণী কিছুই না লিখে কেবল কাগজে '১' সংখ্যাটি লিখে দিলেন। রাজা কিছুই বুঝতে না পেরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোটরাণী তো আর কিছু লেখেননি, কেবল ১ সংখ্যাটি লিখেছেন, এর অর্থ তো বোঝা যাচ্ছে না'। মন্ত্রী জবার দিলেন 'মহারাজ ছোটরাণী অতীব বুদ্ধিমতী, তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, উনি অন্য কিছু চাননা, কোন জাগতিক বস্তুতে তাঁর মোহ নেই। তিনি শুধুমাত্র আপনাকেই চান।

রাজা যুদ্ধে গেলেন ও জয়ী হয়ে ফিরলেন। রাণীদের ফর্দ মত সব জিনিস আনা হয়েছে— তা সব তাদের ঘরে পৌঁছে গেল। আর ছোটরাণীর ঘরে গেলেন স্বয়ং রাজা। সেখানে তখন আনন্দের ধূম— রাজা নিজে যেখানে উপস্থিত সেখানে আর কিসের অভাব!

বড় মহারাজ এবার বললেন "পরমাত্মারূপী রাজার কাছে অন্য কিছু চাইবেনা স্বয়ং পরমাত্মাকেই চাইবে। যে পরমাত্মারূপী রাজাকে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অষ্টসিদ্ধিরূপ যা সম্পদ বিভূতি তাই পেয়ে যাবে। নিষ্কামী সাধক কিছুই চাননা কিন্তু তাঁর সবকিছুই আপনা আপনি পূরণ হয়ে যায়। বহুলোক বলে আমরা এত করে ভগবানকে ডাকি, তাও ওনাকে পাইনা। এর যে কি কারণ তাও বুঝে উঠতে পারিনা।" এদের আমি বলি তুমি সূঁচ দান করে আচ্ছাদন আশা করতে পারোনা। তুমি যদি পরমাত্মার সঙ্গে মিলন আশা করো তবে তুমি আগে তাঁর সঙ্গে মিশে যাও, তবেই উনি তোমার হবেন। দু-চারবার ভগবানের নাম করে তাঁকে চাইলেই-তাঁকে পাওয়া যাবে না।

এ ত গেল বড় মহারাজের কথা। এবার আমরা মহাভারতের একটি গল্প স্মরণ করি। কুরুক্ষেত্রে

যুদ্ধের আগে গেল দুর্যোধন ও অর্জুন দুজনেই সাহায্যের জন্য কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। দুর্যোধন কিছু আগে পৌঁছে দেখলেন কৃষ্ণ ঘুমিয়ে আছেন। তিনি মাথার কাছে একটি আসনে বসে রইলেন। খানিক পর এলেন অর্জুন। কৃষ্ণকে ঘুমন্ত দেখে তাঁর পায়ের কাছে একটি আসনে বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে দুজনকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুজনেই বললেন আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁরা কৃষ্ণের সাহায্যপ্রার্থী। কৃষ্ণ অন্তর্যামী। তিনি সব বুঝলেন আর বললেন আমার এক অক্ষৌহিনী সেনা আছে যারা আমার মতই রণকুশলী। অন্যদিকে আমি একা এবং এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না। এবার তোমরা কে কোনটা চাও। ঘুম থেকে উঠে আমি পায়ের কাছে বসা অর্জুনকেই প্রথম দেখেছি। তাই তুমি বল। অর্জুন করযোড়ে বললেন, তাও আমি তোমাকেই চাই। এদিকে দুর্যোধনও সৈন্য পেয়ে মহাখুশী। ও মনে মনে অর্জুনের নির্বুদ্ধিতাকে প্রশংসা করে ভাবল, ভালই হয়েছে! আমি জিতলাম। এভাবে দুজনে খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। এরপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল তো সকলেরই জানা।

গীতাতেও সকাম নিষ্কাম কর্মের কথা বারবারই বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগে কৃষ্ণ বলছেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।১৯
কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।২০

কর্মে অনাসক্ত হয়ে সর্বদা জগতের জন্য কাজ করে যেতে হবে। সেটাই হবে আমাদের নিষ্কাম আরাধনা। কামনা বাসনা শূন্য হয়ে কাজ করতে পারলেই মানুষ মুক্তি লাভ করবে। এতে আবারো বলা হয়েছে জনক বা প্রভৃতি রাজর্ষি রাজা হয়েও নিষ্কাম কর্ম করে গেছেন এবং পরিশেষে মুক্তিও লাভ করেছেন।

তবে সংসারে আমাদের নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়। আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে ভগবান ও গুরুতে চিত্তসমর্পন করে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তাহলে অন্তে মুক্তি প্রাপ্তির আশা থাকবে।

"শ্রীগুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ একতরফা নহে। আলোক ও অন্ধকার,
দাতা ও গ্রহীতা, Positive-Negative বা অনুগ-প্রতিগ—
এই সম্বন্ধ পরস্পর সাপেক্ষতা লইয়াই আত্মপ্রকাশ করে।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
Rangamati path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal
(A DEDICATED CANCER HOSPITAL)

A LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 02/07/2025 to 15/10/2025)

DATE	RT. NO.	NAME	AMOUNT (RS.)
02-07-2025	1681	Swapna Sinha, Kolkata.	2001.00
02-07-2025	1682	Salt Lake Kirtan Sangha, Kolkata.	20,000.00
04-07-2025	1745	Barun Chanda, Kolkata.	50,000.00
05-07-2025	1746	Arijit Ghosh, Kolkata.	750.00
07-07-2025	1747	Susim Kumar Munshi, U.S.A.	20,000.00
10-07-2025	1748	Arun Kumar Chatterjee.	5,000.00
10-07-2025	1749	Soma Mitra, Kolkata.	1,500.00
10-07-2025	1721	Ashis Sengupta	500.00
11-07-2025	950	A Well Wisher.	1,850.00
17-07-2025	1722	Swapan Kumar Roy & Sharmistha Roy, Kolkata.	1,00,000.00
24-07-2025	1723	A Well Wisher.	2001.00
06-08-2025		Arijit Ghosh (David & Anderson), Kolkata.	750.00
10-08-2025		Soma Mitra, Kolkata.	1,000.00
13-08-2025	1752	A Well Wisher.	1,270.00
27-08-2025		Arijit Ghosh (David & Anderson), Kolkata.	750.00
02-09-2025		Sandip Naha	5,001.00
06-09-2025	1755	Pranati Sarkar, Durgapur	2,500.00

25-09-2025	1724	Madhu Chanda Das in memory of Late Kiriti Das.	5,000.00
25-09-2025	1725	A Well Wisher.	1001.00
01-06-2025to 01-10-2025	1751	P.J.Chandra Finance, Kolkata.	10,000.00
09-10-2025	1756	A Well Wisher.	1,001.00
09-10-2025	1757	A Well Wisher.	2,170.00
10-10-2025	1721	Chandana Dutt.	500.00
10-10-2025	1777	Sri Alok Kumar Mitra.	500.00
13-10-2025	1684	Devtosh Banerjee.	17,000.00
13-10-2025	1685	Debashis Banerjee.	54,101.00
15-10-2025	1778	Chanda Seth.	2,100.00
15-10-2025	1779	Ashis Bhadra.	999.00

PLEASE SEND YOUR DONATION:-

For Donation in Indian Rupees:

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.** Name of the Bank : **STATE BANK OF INDIA, MUCHIPARA BRANCH, DURGAPUR-713212, BURDWAN, WEST BENGAL.**
ACCOUNT NO. 35626526750, BRANCH CODE: 6888, IFS CODE:SBIN0006888.

For Donation in Foreign Currency:

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.** Name of the Bank **STATE BANK OF INDIA, 11, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001, BRANCH CODE: 00691 ACCOUNT NO. 40283076692 SWIFT CODE: SBININBB104, IFS CODE: SBIN0000691**, Account Type: FCRA **(Savings).**

AN APPEAL

Mohonananda Cancer Hospital a dedicated Cancer care hospital is situated at Durgapur West Bengal.

The hospital serves patients not only from Durgapur, Asansol but also from Bankura, Purulia, Burdwan even Malda and Jharkhand. Majority of these patients are from a very poor socioeconomical back ground and are treated exclusively with Swasthya Sathi or at very affordable treatment cost, but the quality of treatment and adherence to international treatment guidelines are never compromised with. Multiple types of cancer as an example cervical cancer is quite frequent in occurrence in these group of patients. Brachytherapy is a cornerstone of treatment in these patients. Considering we are yet not equipped with Brachtherapy hence we do refer these patients to Kolkata at centres equipped with Brachtherapy. Unfortunately due to logistics reasons many of these patient either are unable to receive treatment or reach late for the same resulting in early recurrence of disease (a disease which can be cured with addition of brachytherapy) hence resulting in morbidity and mortality of the patient.

Hence the importance of the aforesaid treatment modality if not only important but also a necessity.

We are happy to inform you all that the Hospital Authority have placed **Purchase Order for "Elekta Brachytherapy Machine"** to Elekta Solutions AB, **Stockholm, Sweden** for cost of **USD 207,000** and the total project cost is expected to be around **Rs. 3 Crores.**

Therefore, on behalf of Durgapur Cancer Hospital we humbly appeal to all the disciples / devotees and well wishers of our Gurudev to please come forward and contribute generously to make this project successful.

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকার গ্রাহকবৃন্দের প্রতি

এতদ্বারা আমাদের গ্রাহকবৃন্দকে জানানো হইতেছে যে গত কয়েকবছর ধরিয়া পত্রিকার প্রিন্টিং বাবদ খরচা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে, ইহা ছাড়া ডাক মাশুলেরও মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে হওয়ায় আমরা পত্রিকার মূল্য কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। আগামী ২০২৬ সাল হইতে ইহা কার্যকারী হইবে।

বার্ষিক অনুদান (৪টি সংখ্যার জন্য) - ১২০ টাকা মাত্র।
ডাকযোগে অনুদান (৪টি সংখ্যার জন্য) - ২২০ টাকা মাত্র।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুদানের কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। পত্রিকার সর্বমোট মুদ্রনসংখ্যা নির্ধারণের জন্য বছরের শুরুতেই মোট গ্রাহক সংখ্যা সঠিক নিরূপণের প্রয়োজন হওয়ায় আমাদের পুরাতন তৎসহ নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের সকলকেই আগামী ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সালের মধ্যে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর আশীর্বাদ এবং সকলের শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনান্তে

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতির-পক্ষে

সেক্রেটারী : শ্রী সুরজিৎ দে

Distributing Centres of
Sree Sree Baleswari Patrika

1. **DEOGHAR**
   Sree Sree Balananda Ashram,
   P.O. Ashram Karanibad,
   Baidyanath Dham, Deoghar
   Jharkhand - 814143
   Ph.: 09955673586
   Mobile : 6203886498

2. **Sri Sri Balananda Ashram**
   10/3, Jamir Lane,
   Kolkata - 700 019
   Ph. : 2440-0933

3. **DURGAPUR**
   Sree Sree Balananda Tirthashram,
   Srimat Chidananda Brahmachari
   Nadiha, Durgapur, Dist. Burdwan,
   Pin: 713201
   Ph. : 0343-2557167
   Mob. : 09934189144 / 9434331258

4. **BAHARAMPUR**
   Mohanananda Debyatan,
   Sri Satyendra Nath Sarkar/Sri Samrat Sen
   5, Churamoni Chowdhury Lane,
   Pin:742101
   Baharampur, Murshidabad.
   Ph. : 03482-251439
   Mob. : 9433330215

5. **JAMSHEDPUR**
   Srimat Dineshanandaji
   24, Ambagan Road,
   S. N.P Area,
   Sakchi,
   Jamshedpur-831001
   Ph. 9234401951

6. **JUGAL MANDIR**
   Sree Sree Balananda Ashram
   Smt. Barnali Banerjee
   Dunlop
   Mob: 9051547954

7. **SHIB NIWAS**
   Sri Tarun Banerjee
   Shibniwas, Nadia
   Mob: 9734809767

8. **ASANSOL**
   Sri Trilok Dutta,
   "Mohan Asis", Street No. S/5
   Sarodapally, Ashok Nagar, Asansol
   Dist. : Burdwan (WB)
   Pin : 713 304 Mob.: 9434838138

9. **BALLY**
   Smt. Chitra Chakraborty
   16, Dharmatala Road (North)
   Badamtala moe, Bally,
   Howrah:711201
   Mob. : 9477460626

10. HOWRAH
Tarun & Mili Mukherjee
220, G. T. Road, Howrah-711102
Ph.: 2642-6831/7659
Mob.: 9830411719

11. Asis Dey
Domjur, Howrah
Near Domjur Post Office
Mob: 9804568070

12. MALDA
Sri Anindya Kumar Roy
Sujata Building, 1st Floor;
Near Matri Sadan,
Vivekananda Pally,
Malda - 732101. W.B.
Mob.: 9474656721/7866807052

13. SILIGURI
Dr. Ramendu Das
80, Collegepara,
P.O. Siliguri - 734401
Mobile : 9434035048

14. KOLKATA
Shree Shree Mohanananda
Samaj Seva Samity.
AE-467, Salt Lake City,
Kolkata - 700 064
Ph.: 2321-2321/5123
Mob: 8017227099

15. Sri Kalyan Lahiri
28/1, Fakir Ch. Mitra Street
Kolkata - 700 009
Ph. : 9903050408

16. Smt. Kanika Paul
120, Garfa Main Road
Kolkata - 700 075
Ph. : 2418-2207
Mobile : 8420248756

17. Sri Ashis Bhadra
58/1/1 K, Raja Dinendra Street
Kolkata - 700 006
Ph. : 2351-8684
Mobile : 9836748040/6290417114

18. **Baranagar Kirtan Sangha**
C/o, Ranu Roy
74/1, Raimohan Banerjee Road
Bonhooghly, Kolkata
Mobile : 8697519097

19. **SRI AMIT BOSE**
17/10A, Jai Ramporejala Road
'Silver Hights' 4th Floor 4D,
Kolkata- 700 060
(Opposite LIC Staff Building)
Mob.: 8240119722/983023432

20. MIDNAPUR
Sri Sukumar Mitra
Mitra Compound
Station Road,
Paschim Midnapur-721161
Ph.: 033222261114
Mobile : 9474713822 /6295913476

21. **Ratan Ghatak** 49, Subhas Avenue P.O. Ranaghat Mob: 9932787128	

<u>For Baleswari Patrika</u>

<u>Shree Shree Mohanananda Samaj Seva Samity</u>
SBI, SALTLAKE,
AE-MARKET BRANCH,
KOLKATA-64
A/c No. 10527195247– IFC CODE-SBIN0006794

“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা— যে সেই ভূমা সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যের চিন্তায় নিজেকে অন্ধ বলিয়া, নিরতিশয় ক্লিষ্টজ্ঞানে চিরব্যথিত বলিয়া মনে করে, তাহার নিকট শ্রীগুরু ও শাস্ত্রবাণী সার্থক। পক্ষান্তরে যে এই জগতের সৌন্দর্য্যপূর্ণ বাহ্যরসে নয়ন ও মনোতৃপ্ত হইয়া নিজেকেই চক্ষুষ্মান ও দৃপ্ত বলিয়া ঘোষিত করে তাহার চক্ষু উন্মোচনের জন্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকার প্রয়োজন নাই।”

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে'

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

হে গুরুদেব, ''তোমার খেলা বিশ্বজুড়ে, চলছে কেবল ভেঙে গ'ড়ে মোরা দেখতে না পাই অন্ধনয়ন''... তবুও তিনি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আমাদের বুঝিয়ে দেন যে আমরা তাঁরই খেলার পুতুল।

না, আজ কোনও গল্প নয়— কয়েকটি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মাধ্যমে সকল গুরুভাই বোনকে জানাতে উদ্যত হচ্ছি তাঁর বলে যাওয়া কথা যে কতটা সত্য, ''গিয়েও আমি যাইনি চলে আছি তোদের কাছে'', দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি আজ তিনটি ঘটনা উল্লেখ করবো। তিনি যে আমাদের বলে গেছেন, ''শুধাবোনা তোদের জাতি কুল ধাম, লব সব পাপ দিব 'হরিনাম'' তার প্রতিফলন ভক্ত হৃদয়ে কীভাবে ধরা পড়েছে আর আজও এই অপ্রকটকালে তিনি তাঁর দেওয়া কথা বজায় রেখে চলেছেন তা, ''কোনও কোনও ভাগ্যবানে বুঝিবারে পায়।''

কিছুদিন আগে পহেলগাঁওয়ে যে ভয়াবহ নৃশংসতা ঘটানো হল, সেখানে সস্ত্রীক আমার গুরুদেবের পরিবারের একজন সেইসময়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এখনও মনে পড়ে ঘটনাটি ঘটেছিল মঙ্গলবার। ওরা রবিবার ফোন করে জানাল টিপ টিপ বৃষ্টি হলেও ওরা খুব ভালোভাবে এই দিকটায় ঘুরে শোনমার্গের পথে চলেছে; ফিরবে দুদিন বাদে। দুদিন বাদে হঠাৎই টি.ভি.তে এই ভয়ানক খবরের আকস্মিকতায় সারা বিশ্ব দুনিয়া স্তব্ধ, আর যাদের পরিচিতরা গেছেন তাদের কথা বলাই বাহুল্য। আমিও খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লাম। ওদের ওয়াটসএপে বারবার জানতে চাইছিলাম কিন্তু পাচ্ছি কই? রাত দুটোর সময় জানালো ওরা বাড়ি পৌঁছে গেছে আর এই ঘটনা তারা এখানে পৌঁছে জানতে পেরেছে; তাদের ফ্লাইট পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে কলকাতায় রওনা হয়েছে। গুরুদেব কোলপেতে যেন তাদের আগলে রেখেছিলেন। পরে ছেলেটি মিডিয়াকে দেওয়া ইন্টারভিউতে জানিয়েছিল, ''হয়তো আমাকে দিয়ে তাঁর আরও কিছু কাজ করানোর আছে— তাই আমার এই প্রত্যাবর্তন'', যার ভয়াবহতার পরশও গুরুদেব তাদের পেতে দেননি।

আমাদের আর এক গুরুবোন, যে অত্যন্ত সহজ সরল গুরুদেব অন্তপ্রাণ; স্বামীকে হারানোর পর দিদিদের পরিচালনাতেই চলে তার সাংসারিক জীবন। নিজের বড়দিকে নিয়ে কিছুদিন আগে ব্যাংকক, তারপর বদ্রী থেকে ঘুরে এসেছে। এবার সে দ্বারভাঙায় গিয়েছিল তার উনআশি বছর বয়স্কা দিদিকে নিয়ে, যিনি ছিলেন সুগার পেশেন্ট। হঠাৎই একরাত্রে দিদির প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হয়, কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না—ডাক্তার এলেন কিন্তু তিনি কী করবেন? স্বয়ং গুরুদেব যে তাঁর সন্তানের জন্য পারের তরী নিয়ে দণ্ডায়মান। বহির্গত হল আত্মা, পড়ে থাকল নিথর দেহ।

এবার সেই ছোটবোন অ্যাম্বুলেন্সে করে সোনার ভারী গহনা পরিহিতা দিদিকে নিয়ে রওনা হল, কলকাতার পথে। চালক বুঝে গিয়েছিল দিদি জীবিত নেই— তবুও অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে সেই অসহায়া বোনকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিল কলকাতায়—এতটুকু আঁচ লাগল না বোনের গায়ে সে যে তখন সব ভুলে মন প্রাণ এক করে শুধুমাত্র শ্রীগুরুকেই ডেকে চলেছে, জপ করে চলেছে; "ডাকার মত ডাকলে পরে (তিনি) কী আর থাকতে পারেন?"

অথচ মাত্র কয়েকদিন বাদে ছাব্বিশে জুলাই-এর 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়, এই বিহার থেকে পেশেন্ট নিয়ে আসার সময়ে অ্যাম্বুলেন্সের নির্মম একটি ঘটনার কথা।

এই সবকিছুই অনুভবের ব্যাপার সবকিছুর ব্যাখ্যা আমাদের কাছে নেই।

এখন উল্লেখ করব তৃতীয় ঘটনাটি। একবার শ্রদ্ধেয় গোকুলজী আমার প্রতিবেশী এক ভক্ত ভাইকে পুরীতে দান করবেন বলে বেশ কিছু কম্বল কিনে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছিলেন তিনি তো খুবই নম্র, সাধুসেবাতে অগ্রণী তাঁর ভূমিকা।

কেনা হল বেশ কিছু কম্বল গোকুলজীতো ফিরে গেছেন পুরীতে। তিনি আমার কর্তাকে সঙ্গী করলেন চালান করে ঐ অত কম্বল নিয়ে একদিনের জন্য পুরী চললেন সেগুলি পৌঁছতে।

এদিকে যে বাড়িতে ওনারা তখন থাকতেন সেটি অনেক পুরনো, বহুদিন রিপেয়ারিং হয়নি। একটি বড় ঘর ছিল যেটিতে থাকত মা ও মেয়ে। সামনের ঘরটিতে একটা সিঙ্গলঘাটে গুরুভাই একাই শুতেন। ওনারা পুরী রওনা হওয়ার ঠিক পরের দিনই সকালে তাঁর স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে এসে দেখে ছাদের বিশাল এক অংশ ধ্বসে এসে সিঙ্গলঘাটটির ঠিক উপরে পড়ে আছে। তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন বলে কে পুরীতে ঠিক ঐ রাতটির জন্যই প্রেরণ করে ছিলেন? একী শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা নয়?

তাই সব মহাপুরুষরাই বলেছেন শরণাগত হওয়ার কথা। বড় মহারাজজী বলে গেছেন বাঁদর ছানার মত হতে। তারা সবসময় মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, মা যেখানে যায় সাথে সাথে সেও যায়। আবার আর একজন স্বামীজি প্রবচনে বলছেন বিড়াল তার ছানাকে বাড়ির মনিবের তুলতুলে বিছানায় বসিয়ে রেখে দিয়ে চলে গেল। ছানাটি আর কী জানে, সে নিশ্চিন্ত আরামে ঐ বিছানায় মনের আনন্দে লাফালাফি করে খেলতে লাগল নির্ভয়ে। ঘরের বাবুটি আসবার আগে আগে মা বিড়ালটি এসে নিজের বাচ্চার ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তাকে ছাই এর গাদায় রেখে দিল। তাই তো শ্রীগুরুর প্রতি যদি আমরা সদা সর্বদা মন-প্রাণ সমর্পন করে থাকতে পারি তাহলে তিনি যে, "কোলে তুলে নেন রে..."। তাই ডাকতে হবে আকুল প্রাণে।।

জয়গুরু

সম্পাদকীয়

পরম অধীশ্বর

বিভিন্ন সময়ে যুগে যুগে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই স্বয়ং ভগবান সর্বজন হিতায় কোনও না কোনও রূপে এই ধরাভূমিতে নেমে এসেছেন। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর...", আমরা সেই অসীমকে সীমানার গণ্ডীতে বাঁধতে পারি কী, তবুও মর্ত্যলোকে যখন মানবরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তখন নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন আছে বৈকি?

জনমানসে ভক্তিচেতনা, ধর্মচেতনা জাগরণের জন্য আমাদের গুরুরূপী ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন যে মহাপুণ্যতিথিতে; সেই তিথি স্মরণ করে তাঁর প্রকট লীলাতেও যেমন আবার অপ্রকট লীলাতেও শিষ্য-ভক্ত সকলে তাঁর আরাধনার মধ্য দিয়ে তাঁকেই স্মরণ করেন। তিনি নির্গুন নিরাকার কিন্তু ভক্তের জন্য যেন রূপ ধারণ করেছেন।

তেমনই ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার আবার তারও উর্ধ্বে। তাঁকে কোনও ভাগে ভাগ করা যায় না— তিনি গুরুরূপে এসেছেন আমাদের উদ্ধার কল্পে। সরাসরি শিষ্যের দেহ শুদ্ধিকরণ করে তাদের কর্ণকুহরে মন্ত্রদান করেছেন, জন্ম-জন্মান্তরের ভার নিয়েছেন দু'হাত পেতে। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও 'দেবতা ভিখারি' হয়ে 'মানব দুয়ারে' গিয়ে গিয়ে হাত পেতেছেন বলেছেন— "তোরা কে কে যাবি আয়"। মানবাত্মাকে হাত ধরে নিয়ে তাদের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছেন। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে হিন্দু সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে সবাইকার মধ্যে জ্ঞানশক্তির চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টায় রত থেকেছেন আবার বলছেন, 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা'। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। একমাত্র ত্যাগই জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে। তাই বলে তিনি কখনই বলেননি তুমি সংসার ত্যাগ করো, ভোগ ত্যাগ করো। তিনি বলেছেন— নিজের অন্তরাত্মাকে জানতে, ভিতরকার শুদ্ধ অন্তরাত্মাকে নিজস্ব পবিত্রতার মাধ্যমে জাগরিত করো।

মাঝে মাঝে দেবতার দ্বারা সৃষ্ট মানুষও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়, সঠিক পথের দিশা খুঁজে পায় না উপনিষদ বলেছে, 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' অল্পে সুখ নেই অর্থাৎ নিজেকে বাহ্যিকসুখে আবদ্ধ না রেখে প্রকৃত পরম যে সুখ তা পাওয়ার জন্য সূক্ষ্ম আনন্দের দিকে ধাবিত হতে হবে। জীবন অনিশ্চিত, 'এপারের খেলা কবে সাঙ্গ হবে' আমাদের জানা নেই। তাই আর দেরী নয়। ব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবের এই পবিত্র জন্মতিথিতে সবাই মিলে তাঁর কাছে বিনম্রভাবে প্রার্থনা জানাই—

"বাহুতে দাও গো সেবার শকতি,
হৃদয়ে দাওগো অচলা ভকতি,
ধ্যানে জেগে থাক মোহন মুরতি..."
শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও প্রাণে, এ মোদের মিনতি।

জয়গুরু জয় ভগবান